ভারতীয় সাধন পরম্পরায় গুরুধারণার বিবর্তন এবং বঙ্গদেশীয় প্রতিগ্রহণ

(বজ্রযান এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলা অনুষদ) পিএইচ.ডি উপাধি লাভের জন্য প্রদত্ত গবেষণা নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার

অভিজিৎ ব্যানার্জি

রেজিস্ট্রেশন নং- AOOBE1100716

তারিখ- ২৬.০৭.২০১৬

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২১

অধ্যায় পরিকল্পনা

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়	গুরু: শব্দার্থ এবং গবেষণা পদ্ধতি
দ্বিতীয় অধ্যায়	গৌতমবুদ্ধ পূর্ববর্তী ভারতীয় সাধনায় গুরু
তৃতীয় অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধ সমসাময়িক ও পরবর্তী ভারতীয় ধর্মে গুরু ধারণার নির্মাণ ও বিবর্তন: থেরবাদ, মহাযান এবং প্রারম্ভিক পৌরাণিক ধর্ম
চতুর্থ অধ্যায়	বঙ্গদেশে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মে গুরু প্রসঙ্গ
পঞ্চম অধায়	চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশের নির্বাচিত ধর্ম সম্প্রদায়ে গুরু
ষষ্ঠ অধ্যায়	গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে গুরু

সিদ্ধান্ত

গ্রন্থপঞ্জি

ভূমিকা

ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের একটি প্রবণতা ১৯৬৫ সালে জে. এন. গন্ডা তাঁর *Change and Continuity in Indian Religion*-এ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মূল যুক্তিটিই বই-এর নামে উঠে এসেছে—পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা। ভারতে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, মূর্তি, সাহিত্যিক অভিব্যক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিববর্তনের সঙ্গেও একটি ধারাবাহিকতা থাকে, অবশ্যই 'বহিরাগত' প্রভাবের কথা বাদ দিয়ে। সময়-সমাজের সঙ্গে ধর্মের ক্রমিক পরিবর্তন সামগ্রিকতায় নয়, বরং ধারাবাহিক বিবর্তনের সূত্রে পড়া সম্ভব। গন্ডা উদাহরণ দিচ্ছেন- মহাকাব্যিক যুগের পরে মানুষের কাছে তন্ত্র-ই ছিল বেদ স্থানীয়। তন্ত্র যোগ সাধনা, হিন্দু আচার, মরমিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈদিক সিদ্ধান্তের সংমিশ্রণে বেদের বিকল্পরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। বেদ পরবর্তী সময়ে রামমোহন রায় এবং দয়ানন্দ সরস্বতী-র তত্ত্ব নির্মাণের অংশ হয়ে ওঠে। বঙ্গদেশে গুরুকেন্দ্রিক বিশ্বাস বজ্রযানী বৌদ্ধ, নাথ সাধক, ধর্মপূজক গোষ্ঠী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব অথবা সহজিয়া বৈষ্ণবদের হাতে সময় ও সম্প্রদায়ভেদে প্রতিনিয়ত বিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব এবং অবশ্যই তৎকালীন সমাজ প্রতিবেশ। আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষীয় ধর্ম সাধনার প্রেক্ষিতে বঙ্গদেশের গুরু সংক্রান্ত বিশ্বাস এবং সামগ্রিকভাবে বঙ্গদেশের ধর্মচর্যায় গুরুবাদের বিবর্তনের ইতিহাসটি বোঝার চেষ্টা করা। আমাদের বর্তমান আলোচনা ব্রিটিশ উপনিবেশ পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও গুরুবাদের অস্তিত্ব এবং গুরুকেন্দ্রিক ধর্মজীবন আজও ভারতবর্ষে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। 'মধ্যযুগ'-এর গুরুকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত গুরুবাদের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। পরিবর্তনের সঙ্গে ধারাবাহিকতাই যেহেতু ভারতবর্ষের ধর্ম-সাধনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য—তাই আমরা বৃহত্তর ইতিহাসের অংশ হিসাবেই বর্তমান গবেষণাকে দেখতে চাইব।

গবেষণা পদ্ধতি:

প্রথমত, গুরু ধারণাটির বিবর্তনের ইতিহাসকে সাধ্য-সাধনের বিবর্তন এবং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হবে ভারতবর্ষীয় প্রবণতার সাপেক্ষে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ক্ষেত্রে দার্শনিক ভাবনার বিবর্তন আলাদা করে চেনার চেষ্টা করা হবে।

তৃতীয়ত, বিবর্তনের ইতিহাস বোঝার জন্য মূলত শাস্ত্রের উপর জোর দেওয়া হবে। অবশ্যই গুরুদের কোন রচনা পাওয়া গেলে অথবা প্রাসঙ্গিক সন্তচরিত জাতীয় রচনা থাকলে তার সাহায্য নেওয়া হবে। সামাজিক সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে আমরা অনুশাসন, দানপত্র, দলিল ইত্যাদি ঐতিহাসিক এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যিক উপাদানকে ব্যবহার করেছি।

চতুর্থত, আমরা ভারতবর্ষের ধর্ম ভাবনার প্রেক্ষিতে বঙ্গদেশের প্রতিগ্রহণ বুঝতে চাইছি। ফলে আমাদের আলোচনায় বঙ্গদেশকে সবসময়েই একটি বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে।

পঞ্চমত, ধর্ম-দর্শনের বিবর্তনের কারণটি সমাজ-অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হবে।

গবেষণা প্রশ্ন:

বর্তমান কাজে প্রতিগ্রহণের (Reception) উপর আমরা বিশেষ নজর দিতে চেয়েছি। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্ম, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ যোগ সূত্রটি ক্রমে আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়েছে। বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি, অহমিয়া এবং সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষার জন্য আমরা অনেক সময়েই অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছি। গুরু ধারণার ক্রমবিকাশ বোঝার জন্য সাহিত্যিক এবং দার্শনিক রচনার তাত্ত্বিক ভিত্তির উপরেই মূল জোর ছিল। পাশাপাশি এই বিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য সামাজিক অবস্থার দিকেও আমরা সবসময়ে মনোযোগ রাখতে চেয়েছি। বঙ্গদেশের মাত্র দু'টি সাধনাকে কেন্দ্র করেই আমাদের বর্তমান গবেষণা। তবে উপযুক্ত সময় পেলে এই কাজের বিস্তৃতি সম্ভব। ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে বঙ্গদেশের গুরুকেন্দ্রিক সাধনার ধারায় বিবর্তন বোঝার জন্য বর্তমান গবেষণাকে একটি কেস স্টাডি (Case Study) হিসাবে উপস্থিত করাই ছিল বর্তমান গবেষণার মূল প্রকল্প।

আমাদের গবেষণায় একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন রয়েছে — ধর্ম-দর্শন ভেদে, মুখ্যত সাধ্য-সাধনের নিরিখে ‘গুরু’র ভূমিকায় কোন পার্থক্য লক্ষ করা যায় কি না? অর্থাৎ আমরা ‘গুরু’র ধর্মক্ষেত্রে ভূমিকা এবং কর্ম পদ্ধতিকে একটি ধর্মের চিহ্নক হিসাবে ব্যবহার করতে পারি কি না? — এই প্রশ্নটিকে মাথায় রেখেই আমরা বঙ্গদেশের কয়েকটি সাধন ধারার মাধ্যমে বিষয়টি বুঝতে চেয়েছি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলি হল—

প্রথমত, ভারতবর্ষীয় ধর্ম সাধনার সঙ্গে বঙ্গদেশীয় প্রবণতার সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করা।

দ্বিতীয়ত, গুরুকেন্দ্রিক উপাসনার সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতির সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করা।

তৃতীয়ত, ভারতবর্ষের ধর্ম পরম্পরায় গুরু ধারণাটি কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার মূল বাঁক বদলের জায়গাগুলি বোঝার চেষ্টা করা।

চতুর্থত, বঙ্গদেশে বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধনা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় গুরু ধারণা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করা।

অধ্যায় সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়: গুরু: শব্দার্থ এবং গবেষণা পদ্ধতি

শব্দার্থের থেকে গুরুকেন্দ্রিক বিশ্বাসে যে ক্রমিক বদল এসেছে তা অনুমান করা যায়। আবার ইসলাম, ইহুদি, খিস্টান ধর্মে গুরু স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় সবক্ষেত্রেই গুরুর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যোগাযোগ ছিল। জনজাতি সমাজেও ধর্মগুরুরা সমাজ নিয়ন্তার ভূমিকা পালন করেন। ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসেও রাজনীতি এবং অর্থনীতির সঙ্গে এই সমীকরণটি কাজ করে। শব্দার্থের দিক থেকে গুরু শব্দটিতে নানা বদল আমাদের চোখে পড়ে। যেমন— ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে বিশেষত বৈদিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'আচার্য' শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ব্যবহারের দিক থেকে আচার্য শব্দটি গুরুর থেকে প্রাচীন। যদিও সংস্কৃতে অনেক সময় আচার্য এবং গুরু শব্দদুটি সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন কুল্লুক ভট্ট *মনুস্মৃতি*-র টীকায় অথবা মল্লিনাথ 'শিশুপালবধ' নাটকের টীকায় আচার্য এবং গুরু শব্দ দুটিকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'আচার্য' শব্দটির উল্লেখ শিক্ষক অর্থে পাচ্ছি *অথর্ব বেদ*-এ। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ শাণ্ডিল্য এবং সাপ্তার্থবাহিনী-কে আচার্য এবং অন্তেবাসী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আচার্য উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। *ছান্দোগ্য* এবং *তৈত্তিরীয়* উপনিষদেও আচার্যকে আমরা সাবিত্রী দীক্ষাদাতা এবং বেদজ্ঞান দাতা হিসেবেই পাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আচার্যের উক্ত কার্যের সাপেক্ষেই *মনুস্মৃতি* এবং *অমরকোষ* মতে আচার্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়েছে। তবে 'বেদ' শব্দটি যেহেতু 'বিদ্' ধাতু সঞ্জাত সে কারণে আচার্য কেবল বেদ শিক্ষা দান করবেন এমন নয়, তিনি সর্বার্থেই এ কোন শিক্ষা তার শিষ্যকে প্রদান করতে পারেন। উপনিষদের বয়ানে আচার্য শিষ্যকে দর্শনের এবং অধিবিদ্যার শিক্ষাও দান করবেন। অর্থাৎ কেবল সমাজে বাঁচার উপযুক্ত শিক্ষাই নয় আচার্য দৈনন্দিন জীবনের ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষাও শিষ্যকে প্রদান করে থাকেন। শিষ্য তার জীবনের প্রথম আশ্রমটি আচার্যের গৃহেও অতিবাহিত করে। সংস্কৃত মহাকাব্য এবং অন্যান্য রচনায় আচার্যকে কেবল বেদশিক্ষাই নয় পাশাপাশি নানাবিধ চারুকলার শিক্ষা প্রদান করতেও দেখা যাচ্ছে। *হর্ষচরিত* এবং *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* নাটকে আচার্য বীণায় পারদর্শী, *দশকুমার চরিত*-এর বর্ণনা অনুযায়ী আচার্য নৃত্য এবং শৃঙ্গার নৃত্যের শিক্ষা প্রদান করেন রাজপুত্রদের। এর পাশাপাশি আচার্য বিবিধ লিপিজ্ঞান, বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান, ধর্ম-শব্দ-জ্যোতিষ-তর্ক-মীমাংসা, কৌটিল্যের নীতি ইত্যাদি শিক্ষাও দান করছেন বলে দেখা যায়। পালি *জাতকের* গল্পে আচার্য শিল্প শিক্ষা প্রদান করছেন বলে দেখা যায়। তবে পালি *জাতকে* কখনো কখনো আচার্য শব্দটিকে পুরোহিত-এর সমার্থক হিসেবে দেখা যায়, কখনো আবার উপাধ্যায় অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যদিও বৌদ্ধ বিনয় অনুযায়ী আচার্য হলে সূত্র ব্যাখ্যাতা এবং পাঠদাতা

অন্যদিকে উপাধ্যায় মুখ্যত আচার তথা সংঘ নিয়মের নিয়ন্তা। *বিনয়পিটক*-এর সমন্তপসাদিকা টীকায় বুদ্ধঘোষ পাঁচ প্রকার আচার্যের কথা বলছেন — পব্বজ্জাচারিয়, উপসম্পদাচারিয়, নিসসয়াচারিয়, উদ্দেসাচারিয় এবং অবাদাচারিয়। এর পাশাপাশি বুদ্ধঘোষ আবার আচার্যদের প্রাথমিক এবং গৌণ এই স্তরেও ভাগ করেছেন। একই ভাবে জৈন ধর্মের ক্ষেত্রেও বাচনাচার্য এবং উদ্দেশনাচার্য এই দুটি বিভাগ দেখা যাচ্ছে। কৌটিল্য-র *অর্থশাস্ত্র*-এ আচার্য শব্দটি পঞ্চাশেরও বেশি বার ব্যবহৃত হয়েছে। মনে রাখতে হবে আচার্য সম্বোধন থেকে কাউকে উক্ত আচার্য-র সরাসরি ছাত্র মনে করা যথাযথ হবে না। অনেক ক্ষেত্রেই কোনো একটি বিদ্যায় প্রথিতযশা পণ্ডিতদের সরাসরি আচার্য বলে সম্বোধন করার রীতি প্রচলিত আছে। আবার কিছু সংস্কৃত প্রহসনে আচার্য শব্দটি কাউকে হেয় করার জন্যও ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। 'মত্তাভিলাস' প্রহসনে অপটু অভিনেতাকে 'আচার্য' বলে আক্রমণ করা হয়েছে। সুতরাং আচার্য শব্দটির বহুবিধ ব্যবহার সংস্কৃত সাহিত্যে পাচ্ছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আচার্য শব্দটি শিক্ষক অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। তবে এর পর্যায়বাচক বেশ কিছু শব্দও বৈদিক এবং পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আমরা মূলত যে দীক্ষাগুরুর কথা আলোচনা করতে চাইছি তাঁর মধ্যেও আলোচিত গুণের সমাবেশ দেখা যায়। অবশ্যই 'আচার্য'-এর গুণাবলীর তুলনায় গুরু আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী। আমরা এই পরিবর্তনের ইতিহাসটিকেই বুঝতে চাইছি বর্তমান গবেষণায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: গৌতমবুদ্ধ পূর্ববর্তী ভারতীয় সাধনায় গুরু

গৌতম বুদ্ধ পূর্ববর্তী ভারতীয় সাধনায় গুরু ধারণা কী অর্থে কার্যকর ছিল তা বোঝার চেষ্টা বর্তমান অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা সংক্ষেপে সিন্ধু সভ্যতা এবং ইরানীয় সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই দুই সংস্কৃতিতে ঈশ্বরের সঙ্গে সাধারণের যোগাযোগ স্থাপনকারী রাজা বা পুরোহিতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে আমরা দুটি সাধনার ধারা দেখতে পাব—ঋষি ধারা এবং মুনি ধারা। গুরুকেন্দ্রিক সাধনার ধারায় মুনি ধারাই কার্যকর হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: গৌতম বুদ্ধ সমসাময়িক ও পরবর্তী ভারতীয় ধর্মে গুরু ধারণার নির্মাণ ও বিবর্তন: থেরবাদ, মহাযান এবং প্রারম্ভিক পৌরাণিক ধর্ম

এই অধ্যায়ে আমরা গুরু ধারণা থেরবাদ এবং মহাযানী বৌদ্ধধর্মে কীভাবে বিবর্তিত হল তা আলোচনা করেছি। বৌদ্ধ দর্শনের বিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা থেকে গুরু প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত তৈরি করতে সমর্থ হয়েছি। থেরবাদে আচার্য এবং উপাধ্যায়ের মূল কাজ ছিল শিষ্যকে শীল-চর্যার অনুশাসন দান, ধ্যানের বিষয় প্রদান করা ইত্যাদি। কিন্তু থেরবাদীরা সবসময়েই শাস্ত্রকে মেনে চলতেন। মহাযান এবং পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানবাদের সূত্রে এই ভাবনায় বদল এল। প্রথমত সাধ্য-সাধনের পার্থক্যের কারণে মহাযানে গৌতম বুদ্ধ ব্যতীত সরাসরি পথ প্রদর্শক রূপে গুরু ধারণার বিকাশ হচ্ছে। এক্ষেত্রে

সাধন মার্গ গুরুরা সরাসরি নির্দেশ করছেন না, শীল-চর্যাকেই মেনে চলতে হচ্ছে। তবে সাধ্যতত্ত্ব নির্মাণে মহাযানে তত্ত্ব প্রণেতা গুরুরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, তত্ত্ব প্রণয়ন করছেন এবং মহাযানে দেবতার ধারণা নির্মিত হয়েছে বলে আমরা তত্ত্ববেত্তা গুরুদের উপাসনা করার ধারা দেখতে পাচ্ছি। যে কারণে দেখা যাচ্ছে তিব্বতি থাঙ্কায় নাগার্জুনের ছবি আঁকা হচ্ছে। তৃতীয়ত, মহাযানের সাধ্যের সঙ্গে যেহেতু সকলের মুক্তির কথা যুক্ত তাই এখানে শিষ্য এবং গুরুর সম্পর্ক অনেক বেশি প্রসার পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ ধর্মের সীমাই অনেক বেশি উন্মুক্ত হচ্ছে। চতুর্থত, মহাযানে ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সাধন মার্গে স্বীকৃত হয়েছে তাই পালি ত্রিপিটকের সঙ্গে এর গুণগত পার্থক্য লক্ষণীয়। পঞ্চমত, বিজ্ঞানবাদ থেকে আমরা বুঝতে পারছি বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য 'আত্ম' সংক্রান্ত ভাবনার প্রভাব ক্রমে স্বীকৃত হচ্ছে, স্থায়ী আত্মার কথা না হলেও বিজ্ঞান পরম্পরার স্বীকৃতিই এই প্রভাবের প্রমাণ। সুতরাং পূর্বপক্ষীয়দের সঙ্গে তর্ক এবং প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি কেবল তত্ত্বে সীমাবদ্ধ থাকছে না। অবশ্যম্ভাবীরূপে সাধনাতেও তার প্রভাব আসতে বাধ্য। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্ষেত্রেও এই পর্বে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বদল দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে গুরু শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি তা পৌরাণিক সাহিত্যের সূত্রেই নির্মিত হয়েছে। এই নির্মাণের কারণটি অবশ্যই ছিল অর্থনৈতিক। যজ্ঞকার্যে ক্রমে দান কমে আসা, ষোড়শ মহাজনপদের পতন এবং ব্রাহ্মণদের ক্রমে গ্রামে ফিরে আসার ইতিহাসই গুরুগিরির সামাজিক প্রেক্ষিত নির্মাণ করেছিল। পৌরাণিক ধর্মে গুরু পরম্পরার স্বীকৃতির পাশাপাশি আমরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্যান্য শাখাতেও গুরুকেন্দ্রিক ধর্মচর্যার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী সময়সীমায়।

চতুর্থ অধ্যায়: বঙ্গদেশে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মে গুরু প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের সাপেক্ষে যে বদল বৌদ্ধধর্মে এসেছিল তা বঙ্গদেশেও অনিবার্যত কার্যকর হয়েছিল। গুরু সংক্রান্ত ভাবনায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এল বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধনায়। এক্ষেত্রে বজ্রযানী সিদ্ধদের ভূমিকা ছিল সব থেকে বেশি। অবশ্যই চীন এবং তিব্বতের সূত্রে বৌদ্ধ সাধনায় গুরুবাদ আরো স্পষ্ট হয়েছিল। বজ্রযানের সাধনা গুরুকেন্দ্রিক, গুরুই শিষ্যের 'সহজ' প্রাপ্তির একমাত্র উপায় হয়ে উঠলেন। শাস্ত্র হয়ে গেল গৌণ। *চর্যাগীতি*-র বিভিন্ন পদে আমরা এই ভাবনারই প্রকাশ দেখতে পেলাম। সিদ্ধ পরম্পরা অবশ্যই বঙ্গদেশের গুরু ভাবনার প্রথম দিকের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। নেপালে আজও অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষই শাক্য এবং বজ্রাচার্যের মাধ্যমে তাঁদের ধর্মজীবনের বিভিন্ন রীতি-নীতি পালন করেন। ফলে বোঝা যায় বজ্রযানী সাধনায় গুরুবাদ এখনো নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে।

পঞ্চম অধ্যায়: চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশের নির্বাচিত ধর্ম সম্প্রদায়ে গুরু

বঙ্গদেশের গুরু সংক্রান্ত ধারণার বিস্তার বোঝার জন্য আমরা ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশের কয়েকটি সাধনার ধারায় গুরু নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। আমরা বর্তমানে আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি কর্ণাটকের লিঙ্গায়েৎ, বঙ্গদেশ তথা সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতে বিস্তৃত নাথ ধর্ম, সূফি এবং সন্ত কবীরের মত, চৈতন্যদেবের সমসময়ে অসমের শঙ্করদেব এবং উড়িষ্যার পঞ্চসখা সম্প্রদায়কে। এই অবধি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় এবং বিভিন্ন প্রদেশভেদে গুরু সংক্রান্ত মনোভাব বিষয়ক আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যোগ বা তন্ত্র নির্ভর সাধনার পাশাপাশি ভক্তিনির্ভর সাধনাতেও গুরু একই রকম গুরুত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে গুরু

ভারতীয় সাধনায় ভক্তিবাদের বিবর্তনের ইতিহাস দিয়ে আমাদের এই অধ্যায়টি শুরু হয়েছে। ভক্তিদর্শনে ভক্তি একই সঙ্গে সাধ্য এবং সাধন। আমরা তাই দেখব গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে গুরুর মূল দায়িত্ব ছিল ভক্তকে ভক্তির শিক্ষা দান করা। তত্ত্বানুসারে এই কারণেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। এখানে আমরা গৌরতত্ত্বের সঙ্গে গুরুতত্ত্বের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেছি। কারণ চৈতন্যদেব নিজে বিশেষ কাউকেই দীক্ষা দেননি। তাই এক্ষেত্রে কীভাবে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সমষ্টিগুরু হয়ে উঠলেন তাই আমাদের মূল আলোচ্য ছিল। এরপরে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে কীভাবে গুরুরাই প্রধান হয়ে উঠলেন তা আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুদের জাতিবর্ণগত অবস্থান এবং গুরুদের লিঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল। সীমিত অর্থে হলেও আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরু ভাবনায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের থেকে পৃথক অবস্থান দেখতে পেয়েছি।

সিদ্ধান্ত

একটি বিস্তৃত সময় পর্বে ভারতবর্ষের ধর্মসংস্কৃতির পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম গুরুরা ভারতবর্ষের ধর্ম সাধনায় প্রথম থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পালন করে আসছেন। আমরা দেখেছি সময়, স্থান এবং ধর্ম-দর্শনের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের গুরু ধারণায় ক্রমাগত পরিবর্তন এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে একথা মানতেই হয় এই ধারণাগত পরিবর্তনের কারণ কেবল ধর্ম-দর্শন কেন্দ্রিক ছিলনা। সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক পটভূমি এই ধারণাকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করেছে। প্রায় সবকটি ধর্ম সম্প্রদায় রাজশক্তির সঙ্গে সমঝোতা করেছে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে দরকারি সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে শিষ্য সমাজের কথা মাথায় রেখেই। বঙ্গদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির আলোচনায় আমরা দেখলাম অনিবার্যত ভারতবর্ষীয় প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই অঞ্চলের রীতি-নীতি চালিত হয়েছে। বজ্রযান এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় গুরুকেন্দ্রিক ধারণা তাই ভারতবর্ষের ধর্ম সাধনার এই প্রবহমানতার সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল। গুরু

সংক্রান্ত বিশ্বাস উনিশ শতক, বিশ শতক হয়ে আজও কীভাবে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে, একুশ শতকে গুরুদের কী ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে এবিষয়ে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসকে পড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসাবে গুরুকে রাখা সম্ভব।